কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্তান

সজল সমাদ্দার

ভারত মহাদেশে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা তাঁর আরাধ্য পিতা। ৮০ বছরের গর্বিত মঙ্গোলীয় বৃদ্ধ, যিনি নিজেকে 'রংউপ' কিংবা 'পঙ্কুপ' বলে পরিচিত করতে বেশি পছন্দ করেন (রংউপের অর্থ 'তুষার শৃঙ্গের সন্তান' অথবা ঈশ্বর পুত্র) সেই পি. টি. সিকিম- এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল কালিম্পং -এর ''ছয় মাইল'' -এর এক পাহাড়ি গ্রামের সংকীর্ণ পথে হাঁটতে হাঁটতে। তার কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম লেপচাদের আরও অনেক নামের মধ্যে রংউপ কিংবা রঙ্কুপ নামটি বেশি পরিচিত। সিমিক আর দার্জিলিং পাহাড়ের ঢালে ঢালে গড়ে ওঠা এই আদিম জনজাতির অতীত সন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, লেপচা সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল উত্তর হিমালয় থেকে তিতালিয়া (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) পর্যন্ত। পূর্বে গিপমোচি পর্বত (সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের সংযোগস্থল) এবং পশ্চিমের অরুণ নদ (নেপালের অন্তর্গত) পর্যন্ত আধিপত্য ছিল ''মায়াল লিয়াং'' (লুক্কায়িত স্বর্গের দেশ) নামক প্রাচীন লেপচা সভ্যতার। ভৌগোলিকভাবে তদের চারটি গোষ্ঠীর বিভাগ করা হলেও ভাষাগতভাবে লেপচারা এক। এই চারটি গোষ্ঠী ''রেনজংমু'' — সিকিম লেপচা, ''ইলামু'' — ইলাম অঞ্চলের লেপচা (পূর্ব নেপাল), ''দামসাংমু'' ঃ কালিম্পং -এর এলপচাগোষ্ঠী এবং 'প্রমু''— ভুটানের লেপচা — এরা ওই অতীত সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আজও।

সেই ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ সিকিম তার কৈশোরের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর শৈশবের দিনে কালিম্পং -এর লেপচা বসতিগুলি ছিল অন্যরকম। কাঠের তৈরি লেপচা কুটীরগুলো (তাদের ভাষায় ''রংলি'') খড়ের ছাউনি আর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হত। চার কুটুরির এই মাচাস্থিত গৃহগুলি ছিল লেপচা নির্মাণশিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়াচে সে সব আজ স্মৃতি মাত্র।

তবু খোল বদলালেও নলচে আজও অপরিবর্তিত — একথা তিনি বিশ্বাস করেন। কারণ ওই নবনির্মিত কুটীর অভ্যন্তরেই আজও বেজে ওঠে বাঁশির সুর আর ড্রামের তাল। যখন ভূমিষ্ঠ হয় নবজাতক লেপচা শিশুটি। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন ''মান '' বা ''লামা'' এবং ''বুংথিং''। তাই এই প্রাচীন ধর্মের নাম ''বুংথিংইজম্'' বা ''মানইজম''। এই বুংথিং-রা কিন্তু কোনো প্রথাগত মন্ত্রোচ্চারণ করেন না। মুখে মুখে প্রচলিত এই কথ্য - প্রার্থনা একমাত্র এই অঞ্চলেই দেখা যায়। তাদের কোনো উপাসনালয় নেই। কারণ তারা বিশ্বাস করে এই পৃথিবী মানবের বাসভূমি আর সেখানে বসবাসকারী মনুষ্যহৃদয়ই ঈশ্বরের বাসস্থল। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল— নানা রং-এর বাহিরি বাঁশের ঝাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢালে। নাম না জানা রডোডেনড্রন আর পাইনের বন মাঝে মাঝে। আর সেইসব ছোট ছোট গাছালি আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো ছড়ানো ছেটানো ঘরবাড়ি। দুচারটে ঘরের এক একটা পাড়া মতন। আর এই প্রত্যেকটি পাড়াতেই অনেকটা অংশ জুড়ে ধানচাষের জমি। কোথাও বাঁধাকপি তো কোথাও সর্ষে শাকের চাষ হচ্ছে। বাড়িগুলোর সামনে মেয়েরা কাঠের হামলদিস্তায় শস্যের দানা ভাঙছে। সুঠাম শরীরের ঋজুদর্শন সিকিম সরু সরু পাকদন্ডী বেয়ে এরকম সব পাড়ার মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কালিম্পং শহর থেকে মাত্র সাত/ আট কিলোমিটার দূরত্বের এই লেপচা গ্রামটি বেশ সচ্ছল বলে মনে হয়।

এসেছিলাম লেপচা জনজাতির সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে এই মানুষটির কাছে আর তাঁর কাছ থেকে যতই শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। সিকিম বলছিলেন— ''পমুক পতং আয়ুত সা ডুকুং মো'' অর্থাৎ ঈশ্বর লেপচাদের সৃষ্টিকালের সঙ্গে করে বংশদন্ড দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় ২২ রকমের বাঁশ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ১২০০ ফুট উচ্চতা অনুযায়ী দেখা যায়, যা লেপচা স্থাপত্যের ধারক বলা চলে। আজও গৃহনির্মাণ থেকে আসবাব এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিস পর্যন্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। এ তো গেল বংশদন্ডের ইতিহাস আর তাদের বংশের ইতিহাস?

লেপচাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য নেই। তবে প্রায় ৬৮ রকমের গোষ্ঠী নাকি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে 'অগনোপ' বা বিবাহ প্রথা তিন / চার রকমের হয়। সম্বন্ধ করে, নিজেদের পছন্দ মতো, অথবা স্বামী বা স্ত্রী মৃত্যুর পর বিবাহ — এই প্রথাগত কয়েকটি রীতি তাদের মধ্যেও দেখা যায়। তবে তফাত হচ্ছে আমাদের সমাজের মতো পাত্র নয়, বিবাহকালে পাত্রীকে অর্থ এবং সম্পদের বিনিময়ে ঘরে তুলতে হয় এমনকি যোগ্যতা বিচারের জন্য বিয়ের আগে কখনও বা পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে থেকে শ্রম দান করে আসতে হয়।

যতই দেখছি নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। ছোট ছোট বাড়িগুলিতে খুদে খুদে সংসার। সুঠাম হাস্যোচ্ছল কর্মঠ লেপচা মেয়েরা সদাই কর্মব্যস্ত। জাপানি পুতুলের মতো শিশুগুলোর মুখে নির্মল শান্তি। ঘরের উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে দুটো/ তিনটি শিশু বাঁশের খোলে 'চি' পান করছে বাঁশেরই সরু নল দিয়ে। 'চি' লেপচাদের সমাজে মদ নয় পবিত্র পানীয়। গর্ভবতী নারী থেকে শিশুর অন্নপ্রাশনের প্রথম আহার এই 'চি'। একটি কুটীরে ঢুকলাম আমরা। পুরুষেরা হাঁটু মুড়ে বসে 'চি' পান করছিল। ওদের সমাজে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা কর্মবিমুখ হয় বেশি। ওরা আমাদের আমন্ত্রণ জানালে কৌতূহলী আমি 'চি' বৃত্তান্তে ডুবে গেলাম। সাধারণত মদ নামেই আমরা সমাজ পতিত হই, কিন্তু লেপচাদের তৈরি কারণ— এর বৈজ্ঞানিক কারণ শুনে এক পাত্তর পান না করে পারলাম না। নানারকম ভেষজ সহযোগে তৈরি এই পানীয় বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাস্থ্যকর। আমার বিকৃত মুখভঙ্গি থেকে সকলে যখন কৌতুক বোধ করছে তখন আমি উঠে পড়ি সিকিমকে সঙ্গে নিয়ে। সকলে দুহাত উর্ধে তুলে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ করে — ''আ চু লে'' যার অর্থ ''ঈশ্বরের জয় হোক''।

'নেশার'-র পাহাড়ি মাদকতায় আচ্ছন্ন আমি সিমিকের কাছে জানতে চাইলাম— ''শুনেছি পাহাড়ি উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি লেপচাদের মধ্যে।'' সিকিমের ৮০ বছরের ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হয়। সে কোমরে গোঁজা বাঁশিটি হাতে তুলে নেয়। আনমনে ফুঁ দিয়ে সুর সাধে বাঁশিতে। —''শহরকেন্দ্রিক এই একটি লেপচা গ্রামে ঘুরেই লেপচাদের সম্পর্কে অনুমান করছেন। তাই তো ! লাভার নাম শুনেছেন?'' সিমিকের প্রশ্ন শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি দেই। সিমিক গাছের পাতার ওপর থেকে একটি বর্ণোজ্জ্বল পোকা হাতে তুলে নিয়ে বলেন— ''লাভার কাছে পোচক বলে একটি গ্রাম আছে। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন লেপচাদের প্রকৃত জীবনচিত্র।''

কালিম্পং থেকে ছুটে গিয়েছিলাম 'পোচক' গ্রামের পাহাড়ি লেপচাভূমিতে। দেখেছিলাম রাতের অন্ধকারে বাঁশের মশাল জ্বালিয়ে কিভাবে ছোট ছোট শিশুরা দুর্গম পার্বত্য স্কুলে শুধুমাত্র লেপচা ভাষায় পড়াশুনো করতে যাচ্ছে। ওরা জানে না ইলেকট্রিসিটি কি, ওরা দেখেনি হাসপাতাল কখনো, এমনকি ওরা আমার মতো মানুষদেরও কম দেখেছে, কিন্তু ওরা জানে কীভাবে সবরকম প্রতিবন্ধকতাকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হয়। আর এই লড়াইয়ের জীবনবেদ থেকেই তাদের সমাজে তৈরি হয়েছে জীবন আর মৃত্যু সম্পর্কে এক অসামান্য দর্শন।

পি টি সিমিক বলেছিলেন মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না। কারণ তাঁর (তাঁদের) বিশ্বাস মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে পূর্বপুরুষদের। ওঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন ওই শীতলধবল পর্বতশৃঙ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলেই মৃত্যুপরবর্তী এক নতুন জীবন অপেক্ষা করে আছে তার মতো প্রতিটি লেপচার। কারণ তারা যে কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্তান।

১. সৃষ্টিকালে সাথে করে বংশদন্ড দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

২. ওদের সমাজে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা কর্মবিমুখ হয় বেশী।